রবীন্দ্র চিত্রকলা অন্বেষা

অশোককুমার রায়

ছবির প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে প্রথমেই যেটি মনে হয়, তা হলো রবীন্দ্রনাথের ছবির একমাত্র মর্যাদা এই নয় যে, তা এক মহাকবির তুলিকা বিলাসের সৃষ্টি। এরকম কোন অভিমত পোষণ করা প্রকারান্তরে চিত্রকলা ক্ষেত্রে কবির আধিকারিত্বকেই সবিনয়ে অস্বীকার করা হয়ে দাঁড়ায়। আবার কবির সাহিত্য কীর্তির কারণে একটা অতি শ্রদ্ধার বাস্প মনে পুষে নিয়ে তাঁর চিত্রকর্মের বিচার করতে বসলে তাতেও অবিচার হবার আশঙ্কা বেশি। কারণ সমালোচকের দৃষ্টির নিরপেক্ষতা খর্ব হয়। যুক্তি হীন বিচারে নগণ্যও যেমন অতিরঞ্জনের প্রলেপে নিজেকে অসাধারণ করে তোলে তেমনি সত্যিই যা অসামান্য তাকেও সামান্যের দীনতায় নেমে আসতে হয়। কাজেই কবি রবীন্দ্রনাথ চিত্রশিল্পী হিসাবে কতদূর কৃতী ও সফলতার সঠিক যাচাই হতে পারে একমাত্র তাঁর চিত্র কর্মের শিল্পোৎকর্ষের বিচারে। প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে যে চিত্রাঙ্কনে রবীন্দ্রনাথ সবরকম ঐতিহ্যের আনুগত্য সোজাসুজি এড়িয়ে গেছেন। এ বিষয়ে কোন দ্বিমতের অবকাশ নেই। তাঁর আঁকা ছবি ভাল বা মন্দ গোড়াতেই এ নিয়ে প্রশ্ন বা বিতর্ক বাদ দিয়ে এটুকু নিঃশংশয়ে বলা যায় যে ছবিগুলি এমন কতকগুলি বিশিষ্টতায় ওতপ্রোত যা চোখের দেখার কৌতুহলকে টেনে নিয়ে দূর মনালোকে পৌঁছে দেয়। এত সহজ ও সরল বলেই বোধহয় তা এত বেগবান। মোটামুটি ভাবে নিশ্চয়ই বলা যায়, রবীন্দ্র - চিত্রকলা স্ব - মহিমায় প্রতিষ্ঠিত তাই তাকে বিচার করাও এতো কঠিন। কেননা, নিয়মের ব্যতিক্রমে যার জন্ম তার পরিচয় ও পরিমাপ নিয়মের মাপকাঠিতে সম্ভব নয়। এই অপূর্ব রীতির চিত্রকলার উৎস কি? কবি নিজেই এর পরিচয় সূত্রে বলেছেন ---

''আমারো খেয়াল ছবি মনের গহন হতে
ভেসে আসে বায়ু স্রোতে
নিয়মের দিগন্ত পারায়ে
যায় সে হারায়ে
নিদ্দেশে
বাউলের বেশে।''

'খেয়াল ছবি' -- তার উৎস হল মনের গহন এবং সে ছবি ভেসে আসছে প্রকাশের প্রবাহ ধরে নিয়মের দিগন্ত পারায়ে। পুরানো শিল্প রীতি ও অনুশাসনকে না মেনে তার পরিবর্তে চিত্রকলায় কোন নতুন রীতির প্রবর্তন রবীন্দ্রনাথ করেন নি। কারণ নামানার আবার রীতি কি? রীতির ভেতর একটা - না - একটা সীমাবদ্ধতা ও অনুদারতা থেকে যায়। রীতির হাতে পড়ে শিল্প যেমন কোথাও অপরূপ হয়ে ওঠে তেমনি কোথাও আবার নিঃশেষে হারিয়ে বসে তার আপন রূপ। শিল্পী রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন 'খেয়াল ছবি'। তিনি এখানে রূপকারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হননি। মনের গহন থেকে মুক্ত ধারায় যে অশান্ত কল্পনায় পুঞ্জ ভেসে আসছে তারই অধিকার ভাবরূপটিকে কবি - শিল্পী বর্ণে ও রেখায় ধরবার প্রয়াস করেছেন।

শিল্পীর কর্তব্যে এইটুকু যথেষ্ট নয় যে, তিনি যা আঁকবেন তাই নয়নাভিরাম হওয়া চাই। তাঁর কাজ নয় শুধু চিত্রে, মূর্তিতেও আলেখ্যে রূপের সৌকর্য সাধন। শিল্পীকে আসলে হতে হবে প্রকাশ - কুশল; রীতির ওপর শ্রদ্ধা রাখতে গিয়ে তাঁকে তাঁর মনোচ্ছবিটির প্রতি নিষ্ঠা ক্ষুন্ন করলে চলবে না। এমতবাদ সকল বিতর্ক শেষ করে বহুদিন আগেই ইউরোপে সগৌরবেপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। মধ্যযুগীয় tameness হতে ইউরোপীয় চিত্রকলা মুক্তিপেল সেইদিন যেদিন শিল্পীকুল এই তত্ত্বটিকে বরণ করে নিয়েছিলেন। পিকাসো (Picasso) ও গঁগার (Gaugiue) নিদাণ বিদ্রোহ ইউরোপের শিল্প প্রগতিকে ব্যাহত তো করেই নি বরং তাকে আরো সৃষ্টি - প্রবণ ও গতিশীল করে তুলেছে।
''যেমন তেমন এরা বাঁকা বাঁকা
কিছু ভাষা দিয়ে কিছু তুলি দিয়ে আঁকা।''

তাঁর চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য (টেকনিকের) সম্পর্কে কবি - শিল্পী এই পরিচয় দিয়েছেন। শিল্পী স্পষ্টই স্বীকার করেছেন যে, তাঁর চিত্রের সবটাই তুলি দিয়ে গড়া নয় -- তার কিছুটা আবার ভাষা দিয়ে গড়া। তুলি দিয়ে যেটুকু গড়া তার সবটাই দর্শকের কাছে প্রত্যক্ষ, তাকে সহজেই চিনতে ও বুঝতে পারা যায়। সেটি প্রত্যক্ষ নয়, সেইটিই হল ভাষা দিয়ে আঁকা এবং এই ভাষার অর্থভেদ যিনি করতে সমর্থ হবেন তাঁরই কাছে রবীন্দ্র - চিত্রকলার রূপ ভেদ করা সহজ হয়ে উঠবে।

এখানে একটি প্রশ্ন করা যেতে পারে -- রবীন্দ্র চিত্রকলা কোন গুণে বিশিষ্ট? এই অপ্রত্যক্ষতা, যা ভাষা দিয়ে আঁকা --এইটিই হল তার বৈশিষ্ট্য। চোখের দেখার বদলে মনের দেখাই এখানে বড় সহায়। কবি - শিল্পীর। কবি - শিল্পীর 'ঝাঁকড়া চুল' ও 'একাকিনী' এ দুটি ছবির দিকে দৃষ্টি দিলে চোখের কর্তব্য শীঘ্র ও সহজে সারা হয়ে যায়, তারপর শুরু হয় সমস্ত মন জুড়ে জানাজানির সাড়া-- ''কিছু তার বুঝিনা বা কিছু পাই অনুমানে।''

অলঙ্কার শিল্পকে একটি রূপদান করে সত্য। কিন্তু অলঙ্কারকে সরিয়ে দিলে শিল্পের কোন প্রাণান্তিক হানি হয় না, জলুসই শুধু কমে যায়। রূপ যায় কিন্তু শ্রী থাকে। পাশ্চাত্য শিল্পীরা এই কারণে চিত্রে Prettiness - কে বর্জন করে লাভবানই হয়েছেন। রবীন্দ্র - চিত্রকলায়ও আমরা রূপ - সাধনার দিনর্শন পাই না, পাই অপূর্ব শ্রী সাধনার পরিচয়।

অনেকে রবীন্দ্রনাথের আঁকা কতগুলি চিত্রকে গ্রোটেস্ক ধর্মী (Grotesque) বলে মনে করেন। এ অভিমতকে নিতান্ত উপেক্ষা করা চলে না। কবি - শিল্পীর আঁকা 'ঘন্টাকর্ণ', 'খাসা লেজুড়ী' প্রভৃতি ছবিগুলিকে 'গ্রোটেস্ক' বলে স্বীকার না করে পারা যায় না। শিল্পী যদি চান তাঁর মনোচ্ছবির যথাযথ প্রকাশ, তবে তাঁকে খানিকটা বিরূপের আশ্রয় গ্রহণ করতেই হবে। অন্তশ্চেতনা জুড়ে যেমন ছড়িয়ে আছে রূপের মায়াজাল, তেমনি রয়েছে বিরূপের কুয়াশা। গজানন, গণেশ, নৃসিংহ, স্ফিংক্স ও ড্রাগন যে কল্পনায় সৃষ্টি, সে কল্পনাই দিয়েছে 'ঘন্টাকর্ণকে। কেউ কেউ মনে করেন ' গ্রোটেস্ক' - এর পেছনে থাকে শিশু বা আদিম মানব সুলভ অপ্রবীণ ও অকৃত্রিম কাঁচা মনের কৌতুহল ও প্রেরণা। কেউ কেউ এর পেছনে একটা clown complex এর ছায়া দেখতে পান। এই গ্রোটেস্ক চিত্রে গুহা মানবের দানও কিছু কম নয়। সুতরাং গ্রোটেস্ক অর্থে উদ্ভট কিছুবোঝায় না -- এও সনাতন মনের কীর্তি , যার

পেছনে রয়েছে একটা অর্থের ভিত্তি; যুগের শিল্পীরা অদ্যাবধি তাকে রচনা করে আসছেন। আশ্চর্যের বিষয় বিরূপের ছবি গ্রোটেস্কই গথিক সৌন্দর্যের একটা বড় অবলম্বন। শোনা যায় যে সুর শিল্পী ভাগনার (Wagner) বাদ্যযন্ত্রে এমন একটি সুর আলাপ করতেন যাতে নিস্তরঙ্গ একটি হ্রদের নিঃশব্দতা ফুটে উঠতো। সুতরাং শব্দ যদি নিঃশব্দ রসকে বহন করে আনতে পারে, তবে বিরূপ ও রূপকে বহন করে আনবে এতে বিচিত্র কি আছে? এ কীর্তিতে রবীন্দ্রনাথের তুলিও পূর্ণ সাফল্যের দাবি করতে পারে। 'গেছোবাবা' জিব বের করা কাঁটাওয়ালা' -- এ দুটি এবং এই ধরণের কবির তুলির খেয়ালে রচিত আরো কয়েকটি ছবি ঠিক গ্রোটেস্ক পর্যায়ে পড়ে না। সত্যি কথা বলতেগেলে এরা কোন পর্যায়েই পরে না। ফ্যান্টাসির লঘু মেঘে গড়া এদের দেহ - অবচেতনার পটে ক্ষণে ক্ষণে যে সব অপূর্ব অদ্ভুত মুর্তির উত্থান লয় চলেছে। গেছোবাবার এ্যানাটোমির কোন বালাই নেই। নিখুঁত রেখায়নে বাস্পষ্টতার আলোকে তাকে গোচরীভূত করার উপায় নেই। অবচেতন মনের বিগ্রহ সে, অস্পষ্টতাই তার প্রাণ। দৃশ্যাতীত, , স্পর্শাতীত এই ফ্যান্টাসিকে কবি শিল্পী অপূর্ব নিপূণতায় মুর্তির মধ্যে বেঁধে ফেলেছেন কতকগুলি যথেচ্ছ আঁচড় আর হিজিবিজির পরিবেশে। পূর্বেই একবার উল্লেখ করা হয়েছে রবীন্দ্র চিত্রকলার কোন বিশেষ রীতি নেই। অ- অধিই তার বৈশিষ্ট্য তথা আকর্ষণের অন্যতম কারণ। এতে আমরা পাই তুলির অবলীলা-তুলির অপচার নয়। সুতরাং কবি- শিল্পী রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত শিল্পরীতির যে অন্যথাচরণ করেছেন তাকে কোন ক্রমেই বিদ্রোহ বলা সঙ্গত নয়। পুরাতন ঐতিহ্যের বিনাশের ওপর তিনি কোনো নব্যতার প্রথা দাঁড় করাতে চেষ্টা করেননি। হাসি কান্নার মত জন্ম সাথী যে চিরকেলে শিল্পী তার সংস্কারের বন্ধন ঘুচিয়ে তাকে আপন প্রাণের প্রসাদে, ভাল মন্দ দুঁহু সঙ্গে নিয়ে পরিপূর্ণ বিকাশের জগতে আহ্বান করেছেন। তাকে অলঙ্কারের ভাবে রূপান্তরিত করার সাধনা করেন নি।

গদ্য কবিতার সার্থকতা সম্বন্ধে কবি বলেছেন যে, ''সময় সময় মনের যে কথাটি রূপ পেতে চায় -- তা' একমাত্র গদ্য কবিতাতেই সম্ভব, পদ্য কবিতা তার অক্ষম বাহন; গদ্য কবিতা ছাড়া তার ভাষা রূপটি অন্যভাবে ঠিক ফুটে উঠতে পারতো না। এই উপমাকেরবীন্দ্র চিত্রকলার বিচারে টেনে আনলে অযৌক্তিক হবে না। রবীন্দ্রনাথ যে ভাবে তাঁর আপনার ভাবমূর্তিকে চিত্রায়িত করেছেন, তা অন্যকোন পন্থায় বা রীতির পরিচর্যায় সম্ভবত হতো না।

লেখায় সময় অমনঃপুত অংশগুলোকে যখন কবি কাটছাঁট করেন, তখন তাঁর লেখনী অজ্ঞাত সারে শিল্পীর তুলির ধর্ম গ্রহণকরে বসে। কাটাকুটি গুলিই এক একটি আলেখ্য দাঁড়িয়ে যায়। এই আলেখ্যগুলি কিছুই নয়, আবার অনেক কিছু। এছবির রূপ নেই, কিন্তু সত্তা আছে, অতএব অর্থও আছে। সামান্য হারে দুর্বোধ্যতা থাকলেও অসত্য নয়। এ ছবিগুলিকে প্রতীক ধর্মী বলে ভুল বলা হবে না। বিজ্ঞানীরা এমন কথাও বলেন যে, মানুষের সংসারে চিত্র এসেছে আগে, ভাষা এসেছে তার পরে। প্রাক্ ইতিহাসের মানুষ তার অনেকখানি মনের কথা অতি সহজে বুঝিয়ে দিতে পারতো ছোট্ট একটি প্রতীক চিত্রে। এই প্রতীকই একধারে ছিল তার ভাষা, ভাব, ছবি ও মন্ত্র। উল্লিখিত রবীন্দ্রনাথের আঁকা প্রতীক চিত্রগুলির পক্ষে এইপরিচয় যুক্তি যুক্ত মনে করা যেতে পারে।

‘কাছের মুর্তির চেয়ে দূরের মূর্তিতে তুমি বড়’ - রবীন্দ্রনাথের সমস্ত চিত্রকলা সাধনার পেছনে এই ইঙ্গিতটি সত্য হয়ে উঠেছে।

পরের হাসি কান্না লোকে যেমন হেসে কেঁদেই প্রকৃত উপভোগ করে -- তেমনি রবীন্দ্রনাথের এই ছবিগুলি, এই দূরের মূর্তিকে একমাত্র বোঝা যায়, উপভোগ করা যায় মনের পটে মুদ্রিত করে। আজ যখন আমরা গভীর শ্রদ্ধা ও বিস্ময় নিয়ে তাঁর অপরিমেয় সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে, তখন দেখি আমাদের সব ভাবনার উত্তর তিনি রেখে গেছেন -- কবিতায় ঃ

‘‘যে কথা ভাবিনি বলি সেই কথা,
যে ব্যথা বুঝি না জাগে সেই ব্যথা,
জানিনা এসেছি কাহার বারতা
কারে শুনাবার তরে।
কে কেমন বোঝে অর্থ তাহার,
কেহ এক বলে, কেহ বলে আয়,
আমারে শুধায় বৃথা বার বার---
দেখে তুমি হাসো বুঝি।
কে গো তুমি কোথা রয়েছে গোপনে,
আমি মরিতেছি খুঁজি।’’